সংগীত তত্ত্ব

শাস্ত্র বাক্য মতে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিন বিষয়কে একত্রে **সংগীত** বলে। বাস্তবে এই তিনটি কলা পৃথক পৃথক ভাবে প্রচলিত, পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করা হয়। শাস্ত্রকারদের মত অনুযায়ী এই তিনটিকে কেন সংগীত বলা হয়– তাহার গূঢ় অর্থ হয়তো এই যে, নৃত্য বলিতে কোন কিছুর ছন্দবদ্ধ ওঠানামা, গীত বলিতে গানের বাণী এবং বাদ্য বলিতে তাল ও সুর বুঝায়। অতএব সুর, তাল, বাণী সহযোগে যদি সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি হৃদয়াবেগগুলি মানব হৃদয়কে অনুভূতির ছন্দে দোলাইতে পারে তবেই তাহা সংগীত পদ বাচ্য হয় এবং শাস্ত্রকারদের মতে তাহাই প্রকৃত **সংগীত**।

মনের ভাব প্রকাশ করিতে যে সাংকেতিক চিহ্নগুলি দিয়া অক্ষর তৈয়ারী করিয়া পদ সৃষ্টি করিয়া বিন্যাস করিলে যেমন ভাষা হয়; তেমনি সংগীতেও এই পদ্ধতি বিদ্যমান। স্বরগুলি পর পর সাজাইয়া ভাব রসের প্রকাশ করা হয়। পার্থক্য এই যে, ভাষাতে সাধারণ কথাবার্তা দিয়া নিত্য কাজ-কর্ম যেমন বুঝানো যায়; সংগীতের ক্ষেত্রে তাহা হয় না। ইহাতে ভাবাবেগই প্রধান।

ভাষাতে যেমন স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ আছে; সংগীতেও তেমনি **শুদ্ধ স্বর** ও **বিকৃত স্বর** আছে। শুদ্ধ স্বর সাতটি এবং বিকৃত বা কোমল স্বর পাঁচটি। মোট এই **বারটি স্বর লইয়াই সংগীত গঠিত হয়**।

ভাষার যেমন অ আ ক খ.... বর্ণ; সংগীতে তেমনি **ষড়জ রেখাব গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ/নিখাদ.....** স্বর। ইহাদের আদ্যাক্ষরগুলি লইয়া সা রা গা মা পা ধা না উৎপন্ন হয়।

মুখ্য এই সাত স্বরের মধ্যে ষড়জ ও পঞ্চমের কোন বিকৃত রূপ হয় না বলিয়াই এই দুইটি স্বরকে **অচল স্বর** বলে। এই অচল স্বর দুইটি বাদ দিলে বাকি আর পাঁচটি স্বরের বিকৃত রূপ আছে। যে স্বরটি তাহার নিজের নির্দিষ্ট স্থান হইতে নীচে অর্থাৎ কম থাকে তাহাকেই **কোমল বা বিকৃত স্বর** বলে; আবার যে স্বরটি তাহার নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচা অর্থাৎ চড়া থাকে তাহাকে **কড়ি বা তীব্র স্বর** বলে। দুইটি উপায়ে ইহাদের লেখা যায়। যেমন–

সা	রা	গা	মা	পা	ধা	না
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
অচল	ঋ	জ্ঞ	ক্ষ	অচল	দা	ণা

অথবা

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
অচল	রে	গা	মা	অচল	ধা	নি

বাংলা স্বরলিপিতে কোমল স্বরের চেহারা পরিবর্তন করিয়া রেখাব **ঋ**, গান্ধার **জ্ঞ**, ধৈবত **দা**, নিখাদ **ণা** এবং কড়ি মধ্যমটির রূপ পাল্টাইয়া **ক্ষ** এইভাবে লেখা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার হিন্দুস্তানী সংগীত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। উহাতে কোমল বুঝাইতে স্বরের নিচে একটি আড়াআড়ি দাগ দিয়া বুঝান হয় এবং কড়ি বুঝাইতে মধ্যমের মাথার উপর একটি লম্ব টানিয়া দেওয়া হয়।

সাতটি স্বর– সা রা গা মা পা ধা না; এই লইয়া একটি **সপ্তক** গঠিত হয়। মুখ্য সাতটি স্বরকে একটি বাদ দিয়া একটি ক্রমানুসারে পংক্তিবদ্ধভাবে লিখিলে **বেলাবল সপ্তক** গঠিত হয়। যেমন–

সা	ঋ	রা	জ্ঞা	গা	মা	পা	দা	ধা	ণা	না
↓	বাদ	↓	বাদ	↓	↓	↓	বাদ	↓	বাদ	↓
সা		রা		গা	মা	পা		ধা		না

এখানে দেখা যাইতেছে যে, গান্ধার স্বরের পরই শুদ্ধ মধ্যম আসিয়াছে; ওখানে কোন স্বর বাদ দেওয়া হয় নাই। শুদ্ধ সপ্তক গঠন করিতে হইলে গান্ধার স্বরের পরই শুদ্ধ মধ্যম আসিবে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। অতএব, বেলাবল সপ্তক– দুইটি অচল স্বর ও পাঁচটি শুদ্ধ স্বর লইয়া গঠিত হইয়াছে।

সংগীত মূলতঃ ধ্বনি বা Sound হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ধ্বনি দুই প্রকারের– **সংগীত উপযোগী**, **সংগীত বহির্ভূত**। সংগীত উপযোগী ধ্বনিকেই **নাদ** বলে। বহির্ভূত ধ্বনিকে সোরগোল, কোলাহল প্রভৃতি বলা যায়। এখন এই নাদের উপর তিনটি বিষয় মনে রাখা দরকার। যেমন– **নাদের ছোট বড়, নাদের জাতি অথবা গুণ** এবং **নাদের উঁচু নীচু** (ইহাকে ইউরোপীয় শাস্ত্রে Magnitude of Timbre বা Pitch বলে)।

নাদের ছোট বড় ঃ একই নাদ আস্তে অথবা জোরে উচ্চারণ করা যায়। ঢিমা নাদ কেবল পাশের লোকজন ছাড়া শোনা যায় না। কিন্তু জোরে উচ্চারিত নাদ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। শুনিতে দুইটি নাদ আলাদা মনে হইলেও বাস্তবে এই দুইটি নাদই এক। অর্থাৎ ইহাদের কম্পন সংখ্যা একই থাকে।

নাদের জাতি অথবা গুণ ঃ নাদের জাতি অথবা গুণ অর্থাৎ নাদটি কোন বস্তু বা মনুষ্য হইতে আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারার গুণ। যেমন– একই নাদ হারমোনিয়াম, শানাই, সারেঙ্গী, বেহালা, বাঁশী হইতে বাহির হইতে পারে; এই বাদ্যযন্ত্রগুলি না দেখিয়াই নাদ শুনিবা মাত্র বলিয়া দেওয়া যায় যে, এই নাদটি অমুক বাদ্যযন্ত্রের। সুতরাং নাদের জাতি হইতেই নাদের পরিচয় মিলিয়া থাকে।

নাদের উঁচু নীচু ঃ নাদের উঁচু নীচু এক সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এই কম্পন সংখ্যা যত বেশী হইবে নাদ তত উঁচু হইবে এবং কম্পন সংখ্যা যত কম হইবে নাদ তত নীচু হইবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, নাদের ছোট বড় বলিতে কম্পন সংখ্যার ব্যতিক্রম হয় না; কিন্তু উঁচু নীচু বলিতে কম্পন সংখ্যার কম বেশী বোঝায়।

এই নাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন– **আহত** ও **অনাহত**। আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে ধ্বনি তরঙ্গ শ্রুতিগোচর হয় তাহাই আহত নাদ। অনাহত নাদ শোনা যায় না। সংগীত আহত নাদের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত।

আহত নাদকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন– **সুষির, ঘন এবং তন্ত্র**।

সুষির ঃ বাতাসের আঘাতে কোন বস্তুর কম্পন শ্রুতিগোচর হইলে তাহাকে সুষির নাদ বলে।

ঘন ঃ কোন কঠিন পদার্থে অথবা চর্ম দ্বারা নির্মিত বস্তুতে আঘাত জনিত কম্পন শ্রুতিগোচর হইলে তাহাকে ঘন নাদ বলে।

তন্ত্র ঃ পশুর শিরা দিয়া নির্মিত অথবা তার দিয়া নির্মিত যন্ত্র ছড় দ্বারা ঘষিয়া সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গ শ্রুতিগোচর হইলে তাহাকে তন্ত্র নাদ বলে।

নাদের উঁচু নীচু ঠিক করিয়া **মন্দ্র, মধ্য** ও **তার** এই তিন প্রকার অবস্থান নির্ণয় করা হইয়াছে; এদেরকে নাদের **স্থান** বলে। এই প্রত্যেক স্থানে এক একটি সপ্তক মানিয়া **মন্দ্র সপ্তক**, **মধ্য সপ্তক** ও **তার সপ্তক** তৈরী হইয়াছে। সাধারণতঃ মানুষ কথাবার্তা বলিবার সময় যে আওয়াজ সৃষ্টি করে উহাকে মধ্য সপ্তকের নাদ ধরা হয়। উহা হইতে নীচু আওয়াজ হইলে মন্দ্র সপ্তক এবং ঐ দুইটি বাদ দিয়া উঁচু স্বরে কথাবার্তা বলিলে তার সপ্তক সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মন্দ্র সপ্তকের দ্বিগুণ শব্দ মধ্য সপ্তক এবং মধ্য সপ্তকের দ্বিগুণ আওয়াজ তার সপ্তক। যেমন– যদি ধরিয়া লই যে, মন্দ্র সপ্তকের সা স্বরটির কম্পন সংখ্যা ২; তবে ঐ সা এর কম্পন সংখ্যা মধ্য সপ্তকে ৪ এবং তার সপ্তকে ৮ হইবে। সাধারনতঃ সংগীতে মন্দ্র সপ্তকের মধ্যম এবং তার সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত গলার আওয়াজ হয়। অর্থাৎ–

মা্ পা্ ধা্ না্	সা রা গা মা পা ধা না	র্সা র্রা র্গা র্মা র্পা
মন্দ্র	মধ্য	তার

এখন দেখা যাইতেছে যে, সপ্তকগুলিকে বুঝিতে হইলে কিছু চিহ্নের প্রয়োজন। বাংলা স্বরলিপিতে হসন্ত ও রেফ দিয়া সপ্তকগুলিকে বুঝানো হইয়া থাকে এবং বাংলায় **মন্দ্র সপ্তককে উদারা**, **মধ্য সপ্তককে মুদারা** এবং **তার সপ্তককে তারা** বলা হয়। হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে স্বরের নীচে ফোটা ও উপরে ফোটা দিয়া বুঝান হয়। যেমন–

মন্দ্র সপ্তক							**উদারা সপ্তক**						
সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	সা্	রা্	গা্	মা্	পা্	ধা্	না্
.	.	.	.	.	.	.							

মধ্য সপ্তক

সা রে গা মা পা ধা নি

তার সপ্তক

. . . .

সা রে গা মা পা ধা নি

(হিন্দুস্তানী মতে)

মুদারা সপ্তক

সা রা গা মা পা ধা না

তারা সপ্তক

র্সা র্রা র্গা র্মা র্পা র্ধা র্না

(বাংলা মতে)

আমাদের দেশে সংগীতে দুটি পদ্ধতি বর্তমান। এক দক্ষিণ বা কর্ণাটকী পদ্ধতি এবং দুই উত্তর পদ্ধতি। মাদ্রাজ ও মহীষুর প্রান্তে যে সংগীত শৈলী তাহাকে কর্ণাটকী বা দক্ষিণ পদ্ধতি এবং এ ছাড়া বাংলাদেশ সহ সমগ্র ভারতে যে পদ্ধতি তাহাকে উত্তর পদ্ধতি বলে।

উপরের আলোচনায় সাতটি স্বর লইয়া সপ্তক গঠিত হয় বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সপ্তকের পরিবারের ভিতর **১২** (৭+৫) টি স্বরই অবস্থান করে। অর্থাৎ সাতটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত স্বর লইয়াই সপ্তক পরিবার গঠিত। এই সপ্তক পরিবার হইতেই **থাট'র** উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত পন্ডিতগণ **থাট'কে মেল** বলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নাদ হইতে স্বর, স্বর হইতে সপ্তক এবং সপ্তক হইতে থাটের জন্ম। সংগীত গ্রন্থে থাট সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল–

থাট বা মেল স্বরের এক বিশিষ্ট রচনা; যাহা হইতে রাগের জন্ম হইয়া থাকে। থাট সম্বন্ধে কয়েকটা নিয়ম মনে রাখা উচিৎ। যেমন–

১. থাটে অবশ্যই সাতটি স্বরের ব্যবহার হইবে।
২. এই সাত স্বর– সা রা গা মা পা ধা না; এই নামে এবং এই ক্রম অনুযায়ী হইতে হইবে।
৩. থাটে আরোহণ ও অবরোহণ এর প্রয়োজন নাই। আরোহণ বলিতে মুদারা সপ্তকের সা হইতে ক্রমানুসারে তারা সপ্তকের র্সা পর্যন্ত যাওয়াকে বুঝায়; আবার তারা সপ্তকের র্সা হইতে মুদারা সপ্তকের সা পর্যন্ত ফিরিয়া আসাকে অবরোহণ বলে।
৪. থাটে রঞ্জকতার কোন প্রয়োজন নাই।
৫. থাট হইতে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ রাগ, যাহাতে থাটের পরিচয় আছে (যে থাটে যে রাগই হোক); সেই রাগের নামানুসারে থাটের নামকরণ করিবার নিয়ম। সেই রাগে সাত স্বর থাকুক বা সাত স্বরের কম থাকুক।

সপ্তক পরিবারের **১২** টি স্বর হইতে যেকোন সাতটি স্বর লইয়া নিয়মিত ক্রমানুসারে সা রা গা মা পা ধা না, এই নাম দিয়া অনেক থাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুস্তানী সংগীত পদ্ধতিতে **ভাতখন্ডে**-জী কেবলমাত্র **১০** টি থাট গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাগকে উহার উপর স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে **১০** টি থাট দেওয়া হইল–

১. কল্যাণ (ইমন)	সা রা গা ক্ষা পা ধা না
২. বেলাবল	সা রা গা মা পা ধা না
৩. খাম্বাজ	সা রা গা মা পা ধা ণা
৪. কাফি	সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা
৫. আশাবরী	সা রা জ্ঞা মা পা দা ণা
৬. ভৈরবী	সা ঋা জ্ঞা মা পা দা ণা
৭. ভৈরব	সা ঋা গা মা পা দা না
৮. পূরবী	সা ঋা গা ক্ষা পা দা না
৯. মারবা	সা ঋা গা ক্ষা পা ধা না
১০. টৌড়ি	সা ঋা জ্ঞা ক্ষা পা দা না

রাগের জন্ম থাট হইতে হইয়া থাকে কারণ থাটই হইল রাগের উৎপত্তি স্থান। এক থাট হইতে বহু রাগের উৎপত্তি হইতে পারে। **সংগীত শাস্ত্র সংকেত** গ্রন্থে রাগের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাবার্থ হইল– ধ্বনির এক বিশেষ রচনা, যাহাতে মনুষ্য হৃদয় রঞ্জিত হয় এবং স্বর, বর্ণ সহযোগে সৌন্দর্য প্রাপ্ত হইয়া বিকশিত হয়, গুণীজন তাহাকেই **রাগ** বলে।

সংগীতের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে **বর্ণ** বলে। বর্ণ চার প্রকার। যেমন– **স্থায়ী বর্ণ, আরোহী বর্ণ, অবরোহী বর্ণ** এবং **সঞ্চারী বর্ণ**।

১. স্থায়ী বর্ণ ঃ একই স্বর বার বার বলাকে স্থায়ী বর্ণ বলে।
২. আরোহী বর্ণ ঃ মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ হইতে ক্রমানুসারে নিষাদ পর্যন্ত যাওয়াকে বুঝায়।
৩. অবরোহী বর্ণ ঃ নিষাদ হইতে ক্রমানুসারে মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ পর্যন্ত ফেরত আসাকে বুঝায়।
৪. সঞ্চারী বর্ণ ঃ যাহাতে আরোহী ও অবরোহী দুইটির মিশ্রণে করা হয় তাহাকে সঞ্চারী বর্ণ বলে।

প্রত্যেক গায়কের গায়কীতে এই চার প্রকার বর্ণ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক রাগের আরোহণ ও অবরোহণ ঠিক ঠিক মত হওয়া উচিৎ। রাগের আরোহণ ও অবরোহণ এর স্বর সংখ্যা অনুসারে নির্ধারিত হয় **জাতি**। ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার এক একটি বিভাগকে জাতি বলে। যেমন– **ঔড়ব জাতি, ষাড়ব জাতি** এবং **সম্পূর্ণ জাতি**।

১. ঔড়ব জাতি ঃ যাহাতে পাঁচ স্বরের ব্যবহার হয়।
২. ষাড়ব জাতি ঃ যাহাতে ছয় স্বরের ব্যবহার হয়।
৩. সম্পূর্ণ জাতি ঃ যাহাতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়।

এখনকার হিন্দুস্তানী সংগীত পদ্ধতিতে সর্বমান্য নিয়ম হইল পাঁচটি স্বরের কমে কোন রাগ উৎপন্ন হইবে না। অর্থাৎ ঔড়ব রাগই হইল সব থেকে কম স্বরের।

কিছু নিয়মিত বর্ণ সমুদয়কে **অলংকার বা পাল্টা** বলে। বিশিষ্ট স্বর সমূহ দ্বারাই অলংকার তৈরী করা হয়। উহাতে আরোহী ও অবরোহী বর্ণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গুণীজন এই অলংকারকে **পাল্টা** বলিয়াও প্রচার করিয়া থাকেন। এই অলংকারের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য হইল– যে কেউ স্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রাগ বিস্তারের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবে। অলংকারের জন্য ধরাবাধা কোন নিয়ম নাই। নীচে বুঝিবার সুবিধার জন্য কয়েকটি অলংকার দেওয়া হইল–

১. সারাগা রাগামা গামাপা মাপাধা পাধানা ধানার্সা (আরোহী বর্ণ)
র্সানাধা নাধাপা ধাপামা পামাগা মাগারা গারাসা (অবরোহী বর্ণ)

২. সাগারা রামাগা গাপামা মাধাপা পানাধা ধার্সানা নার্রার্সা (আরোহী বর্ণ)
ধার্সানা পানাধা মাধাপা গাপামা রামাগা সাগারা ন্যরাসা (অবরোহী বর্ণ), ইত্যাদি।

প্রত্যেক রাগেরই বাদী স্বর, সমবাদী স্বর, অনুবাদী স্বর ও বিবাদী স্বর সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা দরকার।

বাদী স্বর ঃ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির ভিতর যে স্বরটি অধিক উপযোগী, বিস্তারের সময় যে স্বরটাকে বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখানো হয়; অর্থাৎ যে স্বরটির উপর রাগ রসের সৌন্দর্য নির্ভর করে তাহাকেই বাদী স্বর বলা হয়। এই বাদী স্বরটিকে উপযুক্তভাবে প্রদর্শন করিতে পারিলে অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়া চিহ্নিত করিতে পারিলে রাগের নাম, উহার গাহিবার সময় ও রাগের লক্ষণ বুঝিতে খুব সুবিধা হয়।

সম্বাদী স্বর ঃ বাদী স্বর হইতে কম কিন্তু অন্যান্য স্বরগুলি হইতে বেশী ব্যবহার করা হয় যে স্বরটিকে তাহাকেই সম্বাদী স্বর বলে।

অনুবাদী স্বর ঃ বাদী এবং সমবাদী হইতে কম কিন্তু অন্যান্য স্বর হইতে বেশী প্রয়োজনীয় স্বরটিকে অনুবাদী স্বর বলে।

বিবাদী স্বর ঃ সাধারণভাবে বলিতে গেলে যে বিবাদ করে সেই বিবাদী; অর্থাৎ যে স্বরটি রাগে ব্যবহার করিলে রাগের রূপের হানি হয়; অর্থাৎ রাগ ভ্রষ্ট হইয়া যায় তাহাকে বিবাদী স্বর বলে। কুশল গায়কগণ যখন এই স্বরটিকে রাগে ব্যবহার করেন তখন ইহাকে বর্জিত স্বরও বলে। কুশল গায়ক, বাদকগণ এই বিবাদী স্বরটিকে নিপুনতার সংগে প্রয়োগ করিয়া রাগের বৈচিত্র ও সৌন্দর্য বহুলাংশে বাড়াইয়া তুলিতে সক্ষম হন।

ধ্রুপদ'র স্থান সকল গীতিরীতির মধ্যে সর্বোচ্চ; কারণ ইহাতে রাগের শুদ্ধতা বজায় রাখা যায়, গতির মধ্যে কোন চঞ্চলতা নাই এবং কথা ক্রমশঃ ভক্তি বা প্রকৃতি বর্ণনামূলক। পাখোয়াজ যন্ত্রে চৌতাল, সুরফাঁক্তা, তীব্রা প্রভৃতি বড় বড় তালের সঙ্গে ধ্রুপদ গীত হয়। ভাব গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টিতে ধ্রুপদই একমাত্র সংগীত। ধ্রুপদে গওয়রহার, খান্ডার, ডাগুর ও নওহার এই চারটি বাণীর কথা শুনা যায়। এই বাণীর মানে কথা নহে, আসলে ইহা গীত গাহিবার রীতি। কিন্তু এই সমস্ত শৈলী বুঝাইয়া দিবার মত গুণী এখন আর দেখা যায় না। ধ্রুপদে লয় ও বাটের কাজ দ্বিগুণ, চৌগুণ সরল কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম, অতীত ও অনাগত গ্রহের কাজও করা হয়। তবে আড়ি, কুয়াড়ি প্রভৃতি বাট শ্রেষ্ঠ গুণীদের মতে ধামারের জন্যই নির্দিষ্ট।

ধামার বা হোরি'র স্থান ধ্রুপদের আসরে। সাধারণতঃ ধামার তালে গীত হয় বলিয়া ইহার নাম ধামার এবং ইহার কথা প্রায়ই হোলি খেলার বর্ণনামূলক বলিয়া ইহার অপর নাম হোরি। ধামারে বেশ বাটের কাজ করা হয়। সেইজন্য ধ্রুপদ অপেক্ষা ইহার ছন্দ বহুলতা অনেক; ফলে সুরের কাজ হইতে ছন্দের দিকেই শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে বেশী। কাহারো কাহারো মতে ধামারই খেয়াল ও সাদ্রা নামক গীত রীতির জনক।

খেয়াল শব্দটি পারসিক। ইহার অর্থ কল্পনা, স্মরণ, বিচার ইত্যাদি। খেয়ালের তুক দুইটি– স্থায়ী ও অন্তরা। মূল গান গাহিতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। কিন্তু বড় গুণীরা খেয়াল গান গাহিতে এক হইতে দেড় ঘন্টা সময় নেন। দুইটি উপায়ে এইভাবে গানের সময় বৃদ্ধি করা হয়। যেমন–

১. গায়কের কল্পনা প্রসূত রাগ বিস্তার। (এই কাজে সফল হইতে হইলে গায়কের রাগ জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। গানের এই বিস্তারের অংশে গায়কের নিজের শিল্প বুদ্ধি ও কল্পনার জন্যই এই গীত রীতির নাম হইয়াছে খেয়াল।)
২. তান ও নানা প্রকার অলংকার প্রয়োগে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি মনে রাখা দরকার। উপযুক্ত তান অত্যন্ত উপযোগী; কিন্তু তানবাজী ভাল নয়।

ঝাঁপতালের গানকে **সাদ্রা** বলে। ইহা দুই প্রকার; যথা– ধ্রুপদাংগ ও খেয়ালাংগ। ধ্রুপদাংগের সাদ্রা ধ্রুপদের আসরে এবং খেয়ালাংগের সাদ্রা খেয়ালের আসরে গীত হয়। সাদ্রা গানে বাট, তান, সরগম ইত্যাদি সব রকমের কাজ চলিতে পারে।

টপ্পা এক প্রকার ক্ষুদ্র গীত, পাঞ্জাব প্রদেশেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিলো। পরে শোরী মিঞা এর প্রচলন করেন। ইহার ভাষা প্রায়ই পাঞ্জাবী, প্রকৃতি চঞ্চল। জমজমা নামক তানই ইহার বিশেষত্ব। প্রাচীন বাংলা গানে টপ্পার প্রভাব বেশ দেখা যায়; তবে বাংলায় বিশেষ রূপে টপ্পা গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। নিধু বাবু'র টপ্পা'র খুব সুনাম ছিলো। সব রাগেই টপ্পা ভালো হয় না।

বর্তমানে সকল প্রকার গীতি রীতির মধ্যে **ঠুমরী**'ই একমাত্র জনপ্রিয় গীতি রীতি; ইহার কথাও সংক্ষিপ্ত। উচ্চকোটি সংগীত পন্ডিতগণ ইহাকে উচ্চশ্রেণীর সংগীতাসরে স্থান দিতে চান না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ রাগরূপ বজায় রাখিয়া ঠুমরী গাওয়া হয় না॥। ইহাতে তানবাজী নাই; কিন্তু খুব বেশী সূক্ষ বিন্যাসের কাজ আছে এবং সেই সব কাজ এত বেশী ভাব প্রবণতাকে আশ্রয় করিয়া গাহিতে হয় যে সকলের পক্ষে ঠুমরী গাওয়া সহজসাধ্য নয়। তবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আজকাল খেয়াল শৈলী ঠুমরী গাহিবার রীতি অনুসৃত হইতেছে।

দাদরা তালে গীত ঠুমরী অংগের গানই **দাদ্‌রা** নামে অভিহিত। সাধারণতঃ বাঈজী শ্রেণীর দ্বারাই এই চটুল ঠুমরী জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

দা, রা দির্ তুম, দ্রেদানি ইত্যাদি অর্থশূন্য বোলকে কথার বদলে ব্যবহার করিয়া এক প্রকার গান গাহিবার রীতি প্রচলিত আছে, এই রীতির নাম **তারানা**। বাংলাদেশে ইহাকে জেলনা বলে। অনেকের মতে আলাউদ্দিন খিলজী'র আমলে প্রসিদ্ধ দার্শনিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু এই তারানা'র প্রবর্তন করেন।

আজকাল একপ্রকার বাংলা গান প্রচলিত আছে, যাহার মধ্যে রাগ রূপ বজায় থাকে অথচ কড়াকড়িভাবে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গানের গীত রীতি অথবা নিয়ম পালন করা হয় না–তাহাই **রাগপ্রধান বাংলা গান** হিসেবে পরিচিত। তবে বর্তমানে **বাংলা খেয়াল গান**'র প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।

---সমাপ্ত---